আদিবাসী মুন্ডাদের জীবন বৈচিত্র

মিলন দাস

পরিত্রাণ
PARITTRAN

গ্রামঃ লক্ষণপুর, ডাকঘরঃ সুভাষিণী, কোড নং -৯৪২০,
থানাঃ তালা, জেলাঃ সাতক্ষীরা।
যোগাযোগঃ ০৪২২৭৭৮১৭৬, ০১৭৪০৫৮৭১০০
ই-মেইলঃ parittran@yahoo.com
www.dalitbangladesh.wordpress.com

আদিবাসী মুণ্ডাদের জীবন বৈচিত্র

প্রকাশকাল:
জানুয়ারী ২০০২

রচনা:
মিলন দাস

আলোকচিত্র:
জেসমিন

অক্ষর বিন্যাস:
মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান

প্রকাশক:
গবেষণা বিভাগ
পরিত্রাণ
গ্রাম-লক্ষণপুর
পোঃ-সুভাষিনী-৯৪২০
থানা-তালা
জেলা-সাতক্ষীরা

শুভেচ্ছা মূল্য:
২০ টাকা

আমাদের কথা

পরিত্রাণ একটি দলিতদের সংগঠন। ১৯৯৩ সাল থেকে দলিতদের জন্য কাজ করছে। কিশোরী উন্নয়ন প্রকল্প, নাগরিক অধিকার অর্জনে উদ্যোগীকরন কর্মসূচী, পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, কমুনিটি উন্নয়ন কর্মসূচী এবং গননাটকের মাধ্যমে দলিতদের অধিকার আদায়ে আন্দোলন আরও বেগবান করছে। দলিতদের উন্নয়ন জাতীয় উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ কেননা দলিতরা এদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর একটি অংশ। তাদের উন্নয়ন ব্যতিরেকে জাতীয় উন্নয়ন কখনও পূর্ণাঙ্গতা লাভ করতে পারেনা। পরিত্রাণ এ জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করার ব্রত নিয়েছে। এপেক্ষাপটে এই দক্ষিন-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলের আদিবাসী মুণ্ডা সম্প্রদায়ের জীবনের ক্ষত-বিক্ষত সংক্ষিপ্তচিত্র তুলে ধরার উদ্দেশ্যে এই পুস্তিকাটির প্রকাশ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে তাদের জরাজীর্ন সামাজিক ব্যবস্থা, ধ্বংসস্তুপ অর্থনৈতিক এবং দুর্বিসহ জীবনযাত্রার সম্পর্কেও তাদের উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। আশা করি এই পুস্তিকাটি তাদের উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রমকে আরও সমৃদ্ধও বেগবান করতে সহায়ক হবে।

ফাদার লুইজী পাজ্জী অনুপ্রেরণায় এবং জো-ইলেন ফোলার-এর আর্থিক সহযোগিতা প্রকাশিত।

আদিবাসী মুণ্ডাদের জীবন বৈচিত্র

পৃথিবীর অনেক দেশের মত বাংলাদেশেও আদিবাসীদের বসবাস আছে। আর এই আদিবাসীদের ভিতর মুণ্ডারা আমাদের দেশে সবচেয়ে অবহেলিত সম্প্রদায়। যশোর-খুলনা তথা দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চল সাতক্ষীরা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় মুণ্ডা সম্প্রদায়ের বসবাস। এসব অঞ্চলের সভ্য মানুষেরা মুণ্ডাদেরকে বুনো বলে জানে। এদেশে কোন আদিবাসী আছে কিনা অনেকে স্বীকার করে না। এমনকি রাষ্ট্র তাদের আদিবাসী হিসাবে নূন্যতম পৃষ্ঠপোষকতা দেয় না। বাংলাদেশে কত সংখ্যা মুণ্ডা সম্প্রদায় বসবাস করে তার হিসাব আজ আর কেউ দিতে পারছে না। অন্যদিকে পেশাচ্যুতি ও কর্মহীনতার কারণে প্রতি বছর বহু মুণ্ডা পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতে পাড়ি জমাচ্ছে। এই তথ্য রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকার করা হবে না। কিন্তু পরিত্রাণ এর পক্ষ হতে আদিবাসী মুণ্ডাদের সাথে কম্যুনিটি প্রকল্পের কাজ করতে গিয়ে একটি অনুসন্ধান চালানো হয়। এ অনুসন্ধানে প্রমাণ মিলে যে, পূর্বে মুণ্ডাদের বসতি সংখ্যা হতে বর্তমানে বেশ কম এক কথায় বলা যেতে পারে তাদের বসতি হ্রাস পেয়ে তিনের এক অংশ এসে দাঁড়িয়েছে। আবার অনেক স্থানে গ্রামের নাম বুনোপাড়া থাকলেও সেখানে বুনো (মুণ্ডা) সম্প্রদায় শূন্য হয়ে পড়েছে।

সভ্যতার যুগে জ্ঞান বিজ্ঞানের তুলনামূলক অগ্রগামী এলাকায় বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর চেয়ে মুণ্ডারা শিক্ষা সংস্কৃতি, বৈজ্ঞানিক, সামাজিক সর্ব বিষয়েই পশ্চাৎপদ। মানব সমাজের সভ্যতা বিকাশের ধারায় বহু পিছনের স্তরে রয়ে গেছে তারা। মূলতঃ এ কারণে যে কোন আদিবাসী বসতিও দেখা যায় একেবারে পশ্চাৎপদ এলাকায়। উন্নত মানবগোষ্ঠীগুলোর অগ্রভিযান বা চাপের মুখে ক্রমশ দুর্গম ও সহজ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন এলাকায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। প্রাগ্রসর জনগোষ্ঠীর সাথে মুণ্ডাদের এক ধরনের অঘোষিত এবং অদৃশ্য সংঘাত আছেই। কোন কোন সময় তারা শেষ আশ্রয় টুকু হারাতে বাধ্য হয়েছে। পুরুষানুক্রমিক ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাওয়ার হুমকি ছাড়াও সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারগুলো ভোগ করতে পারার নিশ্চয়তা টুকুও আজ পর্যন্ত দেশের আদিবাসীরা পাচ্ছে না। কোথাও কোথাও নিত্য নতুনভাবে তাদের অধিকার হরণের পালা চলছে। ক্ষমতাবান মানুষেরা এদের ন্যূনতম মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখে। এ অঞ্চলের মুণ্ডারা বংশ পরম্পরায় 'বেঠ বেগারী' নামক যাতাকলে পিষ্ট।

ব্রিটিশ ভারতে ১৯৩৫ সাল থেকে আদিবাসী ভারত শাষণ বিধান অনুসারে যারা হিন্দু সমাজভুক্ত ধর্মীয় আচরণে এবং অন্তঃজদেরকে তপশীল জাতিভুক্ত করা হয়।

১৯৯০ সালের ডিসেম্বর মাসে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৪৫/১৪৪নং সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৯৯৩ সালকে বিশ্ব আদিবাসি বর্ষ ঘোষণা করা হয়। তাদের উন্নয়নের জন্য ১৯৯৫-২০০৪ সালকে বিশ্ব আদিবাসি দশক হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। মুণ্ডাদের সম্পর্কে সাম্যক ধারণা লাভের প্রয়োজন হয়েছে। উপকূলীয় অঞ্চলের মুণ্ডাদের জীবন থেকে সাম্যক বিড়ম্বনা হ্রাস পাক তাদের জীবন অমানবিক শোষণের চক্রজাল থেকে মুক্ত হোক এ প্রত্যাশা আমাদের সকলের। এই প্রতিবেদনটি ঐ এলাকার মুণ্ডাদের উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলে আশা রাখি।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলের পরিচিতি:

বাংলাদেশের উপকূল ভাগকে তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত করা যায়। ভাগগুলো হলো-দক্ষিণ পূর্ব, মধ্য দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল। দক্ষিণ পূর্বের তেঁতুলিয়া নদী হতে পশ্চিমে ভারত বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমারেখা নির্ধারণকারী হাড়িয়াভাঙ্গা পর্যন্ত বিস্তৃত এই দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। অন্য কথায় বাংলাদেশের যে ত্রিকোন ভূ-ভাগের পশ্চিমে ভাগীরথী, উত্তরে গঙ্গা বা পদ্মা, পূর্বে মেঘনা এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর সেটাই দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল। যা গাঙ্গেয় বদ্বীপ নামে পরিচিতি।

মুণ্ডাদের পরিচিতি ও ক্রমবিবর্তন:

ভারতে রাঁচী জেলায় এদের আদি নিবাস। তাছাড়া মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, ২৪ পরগণা, হুগলী, হাওড়া, বীরভূম, বর্ধমান, মেদিনিপুর প্রভৃতি জেলায় মুণ্ডাদের বসবাস আছে। বাংলাদেশে সাতক্ষীরা, খুলনা, মাগুরা, নড়াইল, দিনাজপুর, রাজশাহী, নঁওগা, বগুড়া, চাপাইনবাবগঞ্জ, রংপুর, পঞ্চগড়, নাটোর, ঠাকুরগাও সিলেটের চা বাগান এলাকাতেও মুণ্ডাদের বসবাস দেখা যায়। রাজা শচীন্য ছিলেন মুণ্ডাদের রাজা। আনুমানিক ১৮৫৭ সালের দিকে জমিদার পুরুসুন্দরীদাসী এই বিশ্ব ঐতিহ্য সুন্দরবন এলাকায় আবাদ করার লক্ষ্যে তাদেরকে স্বপরিবারে নিয়ে আসেন। মুণ্ডারা তীর ধনুকের ব্যবাহরও জানত; ফলে তাদের দিয়ে বন পরিষ্কার করা সহজ ভেবে তখনকার জমিদাররা তাদের ব্যবহার করত। পুরুসুন্দরীর মত জমিদার দেবেন্দ্র সরকারও তাদের ব্যবহার করেছিল। প্রায় ৩ (তিন) হাজার বিঘা জমি আবাদ করার পরে এক পর্যায় তারা এখানে বসতি স্থাপন করে। জমিদার প্রথা বিলুপ্তি হলেও রাঁচিতে ফিরে যাওয়া হয়নি তাদের। সেই থেকে তারা বাস করছে এখানে। গত তিন দশক আগেও বিভিন্ন পাড়ায় ছিল বেশ কিছু মানুষ; কিন্তু এখন আর নেই। অধিকাংশ মুণ্ডারা দৈহিক পরিশ্রমের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে চলেছে।

গোত্র বিভাগ:

তাদের মধ্যে বিভিন্ন গোত্র আছ। যেমন কচুয়া, রূয়া, পদ্মা, টুটি, রাজকূয়া, ভীমরূপ ইত্যাদি। প্রত্যেক গোত্রে একজন করে গোত্র প্রধান আছে। প্রত্যেক কাজে গোত্র প্রধানের কথা মান্য করে চলে।

দৈহিক বৈশিষ্ট্য:

প্রকৃতপক্ষে প্রাচীনকাল থেকেই ভারত বর্ষে বহুজাতিক বহুভাষিক জনগোষ্ঠী এসে বসবাস শুরু করে এবং একে অপরের মধ্যে লীন হয়ে যায়। বাঙ্গালীরা সেই পরিবর্তনের বাইরে নয়। এখানেই জাতি এবং নৃতাত্ত্বিক পর্যায় শব্দ বা শব্দ গুচ্ছের কিছুটা ব্যাখ্যা আবশ্যক। সাধারণভাবে সমসাদৃশ্য বিশিষ্ট কোন বিশেষ শ্রেণীকে জাতি হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়। কিন্তু এর সঙ্গে জীবন যাপন আচার-আচরণ ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি ও ভূখণ্ড প্রভৃতি বিষয়ও যুক্ত। সে কারণে জাতি শব্দের বিশিষ্ট কোন একটা সংজ্ঞা অনুপস্থিত। কিন্তু গবেষকদের মধ্যে সামান্য কিছু মতভেদ থাকলেও নৃতাত্ত্বিক পর্যায় সুস্পষ্টভাবে পার্থক্য করা সম্ভব।

মাথায় চুল ও তার বৈশিষ্ট্য এবং রং; গায়ের বর্ণ, চোখের রং ও বৈশিষ্ট্য, দেহের উচ্চতা, মাথার আকার, মুখের গঠন, নাকের আকার, এসব লক্ষণের মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে। অবয়ব গত এই সাদৃশ্যই মূলতঃ বিশেষ পর্যায়ভুক্ত হিসাবে চিহ্নিত করা হয় বা করা যায়। নৃতত্ত্বের ভাষায় এই আদিম জনগোষ্ঠীকে বলে আদি অষ্ট্রালয়েড।

আদি অষ্ট্রালয়েড দেহিক গঠন হচ্ছে এরা খর্বাকার, মাথার খুলি লম্বা থেকে মাঝারী ধরণের। গায়ের রং কাল এবং মাথার চুলের রং ঢেউ খেলানো কালো। নাক চওড়া ও চ্যাপটা। প্রাচীন সংস্কৃতিতে এদের পরিচয় নিষাদ হিসাবে। বাংলার এই আদিম অধিবাসীদের মধ্যে সাওতাল, লোধা ভুশিক্ত, ঘেরিয়া, মহালী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ওলডহ্যামের মতো মুণ্ডা এবং বাগদীরা মাল জাতীয় শাখা। তাদের জীবন প্রবাহে আদি অষ্ট্রিক প্রভাবে এখনো আছে। বিল বাওড় জলাভূমি বন বাদাড় অঞ্চলে বসবাসে বহু শতাব্দী থেকে। আবার উচ্চ ভূমিতে বসবাস করিয়া নানা পেশায় যুক্ত আছে। এক সময় নীল কররা তাদের নীল প্রস্তুত কাজে লাঠিয়াল হিসাবে ব্যবহার করত। বনে বাদাড়ে বাস করার জন্য হিংস্রও কম নয়। শত্রুদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য তীর ধনুকও ব্যবহার করে। মুণ্ডারা তীর ধনুকে বিশেষ পারদর্শী; তীর ধনুক হাতে নিয়ে চট্টি মুণ্ডার নাম স্বরণ করে।

মুণ্ডাদের বৈশিষ্ট্য:

- বিশুদ্ধ বাংলা উচ্চারণসহ বলতে পারে না।
- এদের মেয়েরা উৎপাদনেসহ বিক্রয়ের কাজে সংযুক্ত।
- এরা কুচি করে শাড়ী পরে না, সঙ্গে অন্তর্বাস ও ব্লাউজ পরে না এরা চুল বাঁধে না বিনুনী ও খোপা বাঁধে না।
- এরা নিজ হাতে চাষ করে কিন্তু জমি নেই।
- এদের ওজন, পরিমাপ ও মুদ্রার ব্যাপারে জ্ঞানের অভাব।
- এরা অশিক্ষিত ও পুষ্টিহীনতায় ভোগে।
- এরা ব্যবসায়ী ঝুঁকি নিতে চান না। মহাজনের ঋণ শোধ করাকে এরা পূণ্য বলে মনে করে।
- এরা ঠেঁঠি পরে এবং চুল বাঁধে খঁসা ও চটু করে।
- এদের বাহ্যিক দুরাবস্থা।
- এরা ভৌগলিক খারাপ জায়গায় বসবাস করে।
- গান-বাজনার দিক দিয়ে বেশী চর্চা করে।
- এরা বেশীরভাগ নেশাগ্রস্ত।
- এরা নিজেরাই নিজেদের উপর দোষ চাপায়।
- এরা আত্মবিশ্বাসের অভাবে ভোগে।
- এদের সার্বিক চেতনার অভাব।
- এরা অধিকার ও সুযোগের ক্ষেত্রে বঞ্চিত।
- এরা ধর্মভীরু।
- এরা দিনমজুর।

মুণ্ডা বিবাহযোগ্য কিশোরীদের একটি অংশ

বৃহত্তর জনগোষ্ঠী ও মুণ্ডাদের পার্থক্য:

মানব সমাজের সর্বশেষ বিকশিত স্তর পর্যন্ত বিবর্তনের ধারায় মানুষে মানুষে নানা রকম পার্থক্য দেখা দেয়। বিবর্তনের দ্রুত প্রক্রিয়ায় তারা সমান তালে অগ্রসর হতে পারেনি। সভ্যতার পথে অপেক্ষাকৃত বেশি দূর এগিয়ে যাওয়া এখানকার বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর তুলনায় এমনকি আহার ও পোশাক পরিধান পদ্ধতিসহ দৈনন্দিন জীবনধারণ পদ্ধতিতেও এরা অনেকখানি পিছিয়ে। সভ্যতার পথে অধিকতর অগ্রগামী জনগোষ্ঠীর সাথে মুণ্ডারা এক অব্যক্ত মানসিক দ্বন্দ্বে বিদ্যমান। তাই তাদের চিনতে কারো খুব বেশী অসুবিধা হয় না। নিম্নে তাদের পার্থক্য দেখানো হল-

ক্ষেত্রসমূহ	সভ্য বৃহত্তর জনগোষ্ঠী	মুণ্ডা জনগোষ্ঠী
সামাজিক অবস্থা ও ব্যবস্থা	অপেক্ষাকৃত দ্রুত পাল্টায় এবং অপেক্ষাকৃত উন্নত	প্রায় পাল্টায় না এবং নিম্ন
অর্থনৈতিক জীবন ধারা	ক্রমশ পরিবর্তিত ও উন্নত হয়েছে	দীর্ঘদিন ধরে অপরিবর্তিত থাকে এবং অনুন্নত
খাদ্য	স্বাভাবিক খাদ্য খায়	ইঁদুর, শামুক, ঝিনুকসহ অসাধারণ খাদ্য খায়
ভাষা	বাংলা	নিজস্ব মাতৃভাষা রয়েছে। যা নাগরী ভাষা নামে পরিচিতি। তাছাড়া বাংলাও তারা জানে
পোশাক	স্বাভাবিক ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে	অস্বাভাবিক ও অপরিষ্কার থাকে
বিবাহ	বাল্য বিবাহ নেই বললেও চলে	বাল্য বিবাহ প্রচলিত নিয়ম
স্বাস্থ্য	স্বাস্থ্য সচেতনতা বেশীর ভাগ মানুষ	বেশীর ভাগ মানুষই স্বাস্থ্য সচেতন নয়
পুষ্টি	স্বাভাবিক কম মানুষ পুষ্টিহীনতায় ভোগে	বেশীর ভাগ মানুষই পুষ্টিহীনতায় ভোগে
সংস্কৃতি	স্বাভাবিক	নিজস্ব সংস্কৃতি আছে।

ভূমি ব্যবস্থা:

মহারাজা বীর মানিক্য ১৯৩১ ও ১৯৪৩ সালে উপজাতি জনগোষ্ঠীগুলির জন্য যে জমি সংরক্ষণ করে গিয়েছিলেন, শ্রী অঘোর দেব বর্মার মতে তা ছিল মুলত এ রাজ্যের উপজাতিদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যই। শংকর বসু মল্লিক তার এক সমীক্ষাতে দেখিয়েছেন শুধুমাত্র সুখময় সেন গুপ্ত মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন সময় উপজাতিদের নির্দিষ্ট জমির সংরক্ষণ আইন উঠিয়ে দেওয়া হলো এবং সুবিশাল উপজাতিদের বসতি ক্ষেত্রগুলি সংরক্ষিত বনাঞ্চলে পরিণত হলো। তখণ উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত ভূমি পুনঃ উদ্ধারের কোন চেষ্টা তৎকালীন কমিউনিষ্ট নেতারা করলেন না। উপজাতিরা ত্রিপুরা উপজাতি-যুব সমিতি নামে একটি সংগঠন করে নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে সম্মানিত স্থানে প্রতিষ্ঠা করার সঙ্গে সঙ্গে জমি ফেরৎ আন্দোলন ও চালাতে লাগালো। কিন্তু সে আন্দোলন সফল হয়নি।

উপকূলীয় মুণ্ডাদের মুখে শোনা যায়, আবাদ গড়ার কাজ শেষ করে কিছু লোক স্থায়ীভাবে থেকে যায়। পরবর্তীতে এদেরকে জমিদার আমলে জমিদাররা আবাদকৃত জমির অংশ দিয়ে বসবাস করার সুযোগ করে দেয়। জমিদাররা তাদের এমনভাবে জমি দান করেছিরেন যে সেই জমি বিক্রয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। ফলে মুণ্ডাদের জমি আর নাম পত্তন হত না। কিন্তু ধীরে ধীরে সহজ সরল নিরক্ষর এই মুণ্ডারা স্থানীয় শোষক মাতব্বর শ্রেণীর হাতে নির্যাতিত হতে থাকে তারা (মাতব্বররা) তৈরী করে এক নতুন কৌশল। তাদের নামে সরদার উপাধি দিয়ে জমি জায়গা এমনকি ভিটেমাটি পর্যন্ত নিজেদের নামে লিখে নিয়েছে। আজ তারা প্রত্যেকেই ভূমিহীন হয়ে পড়েছে। এখনও জমি আছে গাবুরা ইউনিয়নের অকিল সরদারের ৮০/৯০ বিঘা। কিন্তু তার ঘর বাঁধার জায়গা নেই। মামলা চলছে এই জমি নিয়ে। এমনভাবে একের পর এক ভূমিহীনে পরিণত হয় এ অঞ্চলের মুণ্ডারা। ভূমিহীন করার চক্রান্তে তাদের মুণ্ডা পদবী পাল্টিয়ে সরদার পদবী দেয়া হয়। সেই থেকে এই মুণ্ডা পাড়াগুলো কোথাও কোথাও সরদার পাড়া নামে বা বুনো পাড়া নামে পরিচিত।

সামাজিক অবস্থা:

সভ্যতার প্রবাহমান গতিধারায় মুণ্ডাদের করুন ইতিহাস অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। ভূমিহীনতা এবং অব্যাহত দারিদ্রের পাশাপাশি জনসংখ্যার বৃদ্ধির ফলে পরিবেশগত অবক্ষয়ের জন্য এক গুরুতর সমস্যা সৃষ্টি করেছে। উপকূলীয় অঞ্চলের প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, নদী ভাঙ্গন, ভূমি হ্রাস, দরিদ্র, কর্মসংস্থানের অভাবে মুণ্ডারা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সামাজিক কর্মকাণ্ড এবং সামাজিক সুবিধা ভোগের সুযোগ নেই। সভা সমাবেশ, মিছিল, মিটিং, সালিশ, বিচার ও অন্যান্য সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণেরও সুযোগ নেই। খাদ্য পুষ্টি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা, দক্ষতা অর্জন, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে তেমন কোন সুযোগ নেই। নারীদের আয় উপার্জনের সুযোগ কম। অবসর যাপন ও বিনোদনের সুযোগ নারীর তুলনায় অনেক বেশি ভোগ করে পুরুষরা। নাগরিক অধিকার ভোগের কোন সুযোগ নেই। রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত হলেও ভোটাধিকার প্রদানে বাঁধার সম্মুখীন

হতে হয়। বর্তমানে বাঙ্গালীরা মুণ্ডাদের সম্পর্কে যে দৃষ্টিভঙ্গি পোষন করে; তাতে মুণ্ডাদের উপর একটা অবজ্ঞা চিরকালেই প্রচ্ছন্ন ছিল সেটাই প্রমাণিত হয়। বর্তমানে সভ্যতা ও প্রযুক্তি বিকাশের চরম পর্বে উত্তীর্ণ হয়েছে; কিন্তু মুণ্ডাদের জীবন সংগ্রামের চিত্র এখনো বিচিত্র।

অর্থনৈতিক অবস্থা:

মুণ্ডাদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ যে এতই পশ্চাৎপদ তা মুণ্ডাদের চেহারা দেখলে সহজেই বুঝা যায়। সাধারণতঃ এই উপকূলে মুণ্ডাদের বসতি গড়ে উঠেছে বড়বিল নদীর ধারে; অধ্যুষিত জনপদ বাঁওড়, জলাভূমি এবং উপকূলীয় সুন্দরবন অঞ্চলে। এই উপকূলীয় অঞ্চলের বসবাসকারী মুণ্ডাদের প্রধান পেশাই মাছ ধরা। প্রায় সব ধরনের প্রাণী ছিল তাদের আহার্য্য। তারা বিশ্বাস করে যে, মাছ ধরা পুরুষানুক্রমেই তাদের পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্য পেশায় যাওয়াও তাদের জন্য খুবই কষ্টসাধ্য। তাদের পক্ষে বিকল্প কোন খুঁজে নেওয়াটা খুবই কঠিন।

শামুক কুড়ানো আদিবাসী মুণ্ডা মহিলাদের জীবিকা নির্বাহের একটি উপায়।

কথা হয়েছিল হারান মুণ্ডার সাথে। তিনি বলেন 'আমাগের প্রধান অসুবিধে কাজ না থাকা। এখন আগের মতন মাছ থাকে না। মেয়ে পুরুষির জমিতি জন (মজুর) দিতি হয়। কিন্তুক মাছ ধরা ছাড়া আমরা অন্য কিছু বুঝিনো। তাই আমাদের জনের দামও কম। গেরস্তারা আমাগের ঠকাই আমরা কিছু করতে পারিনে মুক বুজি বা সহ্যি কত্তি হয়।

তাদের আদি পুরুষরা তীর ধনুক দিয়ে শুকর, হরিণ, বন্য জন্তু শিকার করত। বর্তমানে করে না। বর্তমানে তারা বাঙ্গালী মহাজনদের জমিতে ধান রোপন করা ধান কাটা, মাড়াই ইত্যাদি কাজ করে থাকে। কিন্তু কিছু মাটির কাজও করে থাকে। অনেক কৃষি ও জনমজুরীর কাজ পুরুষ ও মহিলা একসাথে করে থাকে।

সামান্য হাঁস মুরগি ছাড়া অন্য কোন সম্পদ নেই তাদের। এই হত দরিদ্র মানুষগুলোর জন্য সরকারী কোন সহযোগিতা নেই। সামান্য ভিজিএফ কার্ডও বরাদ্দ করেনি ইউনিয়ন পরিষদ। তিন বেলা খাবারের কথা কোন পরিবার কল্পনা করতে পারেনা । কোন কোন দিন অভুক্ত থাকতে হয়। মাঠ থেকে শালুক তুলে এনে সিদ্ধ করে শাপলার ঢেপ তুলে

সিদ্ধ করে রোধে শুকিয়ে ঢেঁকিতে ভেঙ্গে পরে ভাতের মত রান্না করে খায়। আশ্বিন-কার্তিক মাসে (আগস্ট-অক্টোবর) ভাতের মুখ দেখতে পায়না তারা। খাদ্য হিসাবে তারা শামুক ও ঝিনুক খেয়ে জীবন ধারন করে। মহাজনদের কাছ থেকে উচ্চ হারে সুদে টাকা গ্রহণ করে তারা। 'বেঠ বেগারীর' চুক্তিতেও তারা বেঁচে থাকার চেষ্টা করে। পেশাচ্যুতি ও কর্মহীনতার কারণে প্রতিবছর বহু মুণ্ডার দেশান্তর ঘটছে। তারা চলে যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গসহ ভারতের বিভিন্ন স্থানে। কারণ সেখানে ১৯৭৮ সালে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর থেকে কর্মসংস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান এবং আর্থিকভাবে পুনর্বাসনের নানা কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।

খাদ্য বা খাবার:

এদেশের মুণ্ডারা বহুদিন বসবাস করে তাদের খাদ্য বাঙ্গালীদের মত ভাত ও মাছ; বিভিন্ন ফলমুল ও শাক সবজি। মুণ্ডা মেয়ে পুরুষ এক সাথে পরিশ্রম করে যে অর্থ উপার্জন করে তাতে তাদের তিন বেলা তিন মুঠো খাদ্য পায় না। বছরে তিন মাস কাটে চরম দারিদ্রের মধ্য দিয়ে। এই তিন মাস তারা স্থানীয় বাঙ্গালীদের কাছ থেকে চড়া মূল্যে দাদন নেয়। যেমন এক মন ধান নিলে দেড় মন ধান, কখনও কখনও দুই মন তারও বেশী ঋণ গ্রহণকারী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শোধ করতে না পারলে, তার ছেলে, না পারলে তার ছেলে, এমনভাবে বংশ পরম্পরায় শোধ করে থাকে। গত কয়েকদিন হলো গিয়েছিলাম হরিণখোলা মুণ্ডা পাড়ায়। কথা হলো অনেকের সাথে; তারা জানালেন আমাদের এখন খুবই অভাব, কোন কাজ নেই। পাটকেলঘাটা বাজারের মহাজনদের নিকট থেকে ১৬/১৭ শত টাকা দরে প্রতি কুইন্টাল চাল বাকিতে ক্রয় করেছি। পরে কাজ করে শোধ করে দিতে হবে। মজার ব্যাপার মহাজনরা তাঁদের বাড়িতে বাড়িতে এসে এরকম প্রস্তাব দেয়। অবাক হলাম শালুকের মূল এবং শাফলা ফুলের ঢেপ দেখে। ভাতের বদলে তারা এগুলো আহার করে। মাংশের বদলে তারা শামুক, ঝিনুক ইদুর ইত্যাদির ধরণের খাবার খায়। তাদের প্রিয় খাবার ইঁদুর। এই মুণ্ডারা আবার নেশা করে নিজেদের তৈরী গাজা, চোলাই, মদ, হাড়ি, গাজা, তাড়ি দিয়ে। বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানে তারা এইগুলো ব্যবহার করে।

পোশাক পরিচ্ছেদ:

রাচীতে তাদের পোশাক কি ছিল তা আমাদের জানা নেই। পুরুষেরা এক হাতে একটি নেংটি পরা থাকতো। যুবকরা বাঙ্গালীদের মত লুঙ্গি পরে কিন্তু অত্যন্ত কম দামী; যাতে কোন রকম লজ্জা নিবারণ করা যায়। মেয়েদের সায়া ব্লাউজ নেই, শুধুমাত্র কাপড় পরে। বস্তুতঃপক্ষে প্রতি মানুষ কিছু একটা করে পরনের কাপড়ই তাদের সম্বল। মাঝে মাঝে ঠেঠি পরে এবং চুল বাঁধে খসা ও চুট্টু করে। শীত ঋতু তাদের জন্য খুবই কষ্টকর। কারণ শীতের পোষাক কারও নেই। বৃদ্ধরাই সবচেয়ে বেশি কষ্ট ভোগ করে।

বাসস্থান:

সরকারী সড়ক, ভেড়ীবাঁধ, বা ওয়াপদার উচু রাস্তা কিংবা কোন মহাজনের জমিতে, খাস জমিতে এরা বাস করছে। কোন কোন জায়গায় খাস জমি থাকলেও তাদের নাগালের

বাইরে। কড়কের খড়ের ছাউনি দিয়ে তৈরী মাটির সারি সারি ঘর। এ ঘরে প্রবেশ করতে হয় হামাগুড়ি দিয়ে; ঠিক যেন এস্কিমোদের ঘরে ঢোকার মতো অবস্থা। ঘরের দরজা যতটা স্বল্প পরিসরের তার চেয়ে জানালা অনেক ছোট এবং হাতে গোনা দু'একটি জানালা বন্ধ ঘরে কখনো আলো বাতাস প্রবেশ করে কিনা তা সংশয় আছে। আর এগুলো তাদের মাথা গোজার ঠাই।

আদিবাসী মুণ্ডাদের জরাজীর্ণ বাসস্থানের একটি অংশ এবং কর্মরত কিশোর-কিশোরী

চিকিৎসা:

মুণ্ডা পাড়ায় কোন স্বাস্থ্য কর্মীরা আসেন না; চিকিৎসায় কবিরাজ সম্বল। সনাতনী সেই চিকিৎসা যার ঔষুধ তৈরী গাছ গাছড়ার লতা-পাতা ও শিকড় দিয়ে। যদি কোন কঠিন রোগ দেখা দেয় বড় জোর পল্লী চিকিৎসকের কাছে যায়। এমবিবিএস ডাক্তারের প্রশ্নই ওঠে না; সে সঙ্গতিও তাদের নেই। তাদের প্রতি বছর ঔষুধ ও চিকিৎসা বাবদ ব্যয় পাঁচ থেকে দশ টাকা। কদাচিৎ দু'একজন উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আসে কিন্তু তাদের চেহারা দেখে যখন বুঝতে পারে তারা মুণ্ডা বা বুনো তখণ এদের সাথে স্বাস্থ্য কর্মীরা ভাল ব্যবহার করেন না। অনেক সময় রোগীকে এখান থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছে। অবশেষে অনেক রোগীকে মৃত্যুর মুখে পতিত হতে হয়েছে কথাগুলো জানালেন দক্ষিণ জোড়াশিং গ্রামের রাধারানী মুণ্ডা।

স্বাস্থ্য ও পুষ্টি:

সেই মানুষগুলোর ওই জীর্ণ কুটিরের মতোই হাড় জির জিরে শীর্ণ চেহারার। অস্থি চর্মসার দেহ, পুষ্টি সম্পর্কে তাদের কোন ধারণা নেই। ডিম, দুধ, মাংশ সমপরিমাণ মত খাদ্য যে কত কাল চোখে দেখেনি তা তারা নিজেরা বলতে অক্ষম। অপুষ্টিতে ভোগা তাদের দেহের প্রতিচ্ছবি। প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পরিবার পরিকল্পনা, প্রজনন স্বাস্থ্য এবং ডাইরিয়া সম্পর্কে নুন্যতম জ্ঞানটুকু তাদের নেই। পানীয় জলের সমস্যা এখন দারুনভাবে দেখা দিয়েছে। সমুদ্র তীরবর্তী বনে জল লবণাক্ত; তাছাড়া ভূ-গর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকও

সাতক্ষীরা জেলার তালা থানার হরিণখোলার মুণ্ডাদের সাথে মতবিনিময় করেন ফাদার লুইজী ও আমেরিকান দুতাবাসের জো ইলেন ফোলার

কেসস্টাডি

পায়ের নীচে একটু মাটি চাই

জীবনে আর কিছুই চাই না খালি পায়ের নিচে একটু মাটি চাই। যেখানে ঘর তুললে ভাঙ্গার ভয় থাকবে না। অশ্রু ভেজা চোখে কথাগুলো বলেন সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলার গাবুরা ইউনিয়নের গাবুরা গ্রামের অকিল সরদার। কথা হয়েছিল আরও অনেক লোকের সাথে তারা বললেন, গত কয়েক পুরুষ যাবত আমরা এখানে বসবাস করছি। কিন্তু এই মাটির মালিক আমরা নই। যে কোন মুহূর্তে যে কোন ব্যক্তি প্রভাব খাটিয়ে আমাদের তাড়িয়ে দিতে পারে। মাঝে মাঝে সন্ত্রাসীদের অত্যাচারে অনেকেই এই এলাকা ছেড়ে চলে গেছে। এই পাড়ায় প্রায় ৫০টি পরিবার বাস করছে। সকলেই বাদা কেটে বসতি স্থাপনের জন্য বাংলাদেশে এসেছিল। তারা সকলেই এখন সুন্দরবনের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। কেউ মাছ ধরে কেউ মধু সংগ্রহ করে কেউ কাঠ সংগ্রহ করে এবং কেউ গোলপাতা সংগ্রহ করেন। তারা মাসিক গড়ে এক হাজার থেকে দেড় হাজার টাকা আয় করে। শিক্ষার কোন ছোয়া লাগেনি এখানে। এই গ্রামে সবচেয়ে ধনী লোক ছিল অকিল সরদার প্রায় ৮০/৯০ বিঘা জমি ছিল। কিন্তু আজ তার ঘর বাঁধারও কোন জায়গা নেই। সুচতুর ব্যক্তিরা তার নাম শেষে মুণ্ডার পরিবর্তে সরদার পদবী যোগ করে জমি জায়গা নিজেদের নামে লিখে নেয়। বর্তমানে ৮০ বিঘা জমি নিয়ে মামলা চলছে। মামলার ফলাফল কি হতে পারে জানতে চাইলে তিনি বলেন ঈশ্বরই ভাল জানেন। তবে আমাদের টাকা নেই এবং মামা খালুও নেই। তাই নিশ্চয়তা দিতে পারিনা। জমিগুলো তাদের হাতে কিভাবে গিয়েছে জানতে চাইলে তিনি বলেন আমি লেখা পড়া জানিনে। সময়ে

অসময়ে তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন জনিষিপত্র ধার করে আনতাম। তারা বলতেন এখানে একটা টিপসহি দে। তাছাড়া আমার যখন জমি ছিল তখন ঐ মাতব্বর শ্রেণীর মানুষেরা আমার সাথে ধর্মীয় আত্মীয়তা গড়ে তুলেছিল বড় মাছ, মাংস, আমার স্ত্রীর জন্য ভাল শাড়ি ছেলে মেয়েদের খুবই আদর করত। কেউ কেউ আমার স্ত্রীকে বোন বানিয়েছিল। কেউ কেউ আমাকে ভাই তৈরী করেছিল। প্রত্যেকে এসেছিল চালাকি করতে কিন্তু আমি বুঝতে পারি নাই। আমার এত বড় ক্ষতি তারা সকলে করবে, কয়েক বার স্থানীয়ভাবে সালিশের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু ফলাফল শূণ্য। এখন কোর্টে বিচার চলছে। আপনার কাছে আমার এই মিনতি যাতে আমি নিজস্ব জায়গাতে ঘর বেধে থাকতে পারি তার একটু ব্যবস্থা করে দিন।

চন্দনার আর গ্রামে ফিরে আসা হল না

হরিণখোলা গ্রামটি সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলার নগরঘাটা ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত। এই গ্রামের একপ্রান্তে বিলে মধ্যে ৩০টি আদিবাসী মুণ্ডা পরিবারের বাস। সকলেই তাদেরকে বুনো বলে ডাকে। তারা বুনো বলে স্বীকার করে না তারা বলে আমরা আদিবাসী মুণ্ডা। বর্তমান এই পাড়াটি সরদার পাড়া নামে পরিচিত। ভাসমান শেওলার মত মানুষ এরা। কৃষি এখানকার মানুষের প্রধান পেশা। নারী পুরুষ সকলে একতালে কৃষি কাজ করে। আশ্বিন কার্তিক মাসে ভাতের মুখ দেখতে পায় না তারা। তিনবেলা খাওয়া জোটাতে পারেনা। কোন কোন দিন অনাহারে থাকতে হয়। মাঠ থেকে শালুক তুলে সিদ্ধ করে খেত। শাপলার ঢেপ তুলে সিদ্ধ করে রোদে শুকিয়ে ঢেকিতে ভেনে পরে ভাতের মত রান্না করে খায়। ঐ গ্রামের সহাদেব মুণ্ডার কন্যা চন্দনা। বয়স মাত্র পনের বছর। গত পৌষ মাসে ইরি চাষের সময় কৃষি কাজ করত। ব্লক মালিক মোঃ জাহাঙ্গীর তার বয়স ছিল ৩৬ বছর। জাহাঙ্গীর চন্দনাকে দীর্ঘদিন বিয়ের প্রলোভন দেখাতে থাকে; মাঝে মাঝে কুপ্রস্তাব দেয়। এভাবে বিরক্ত করতে থাকে। কিন্তু চন্দনা তার কোন প্রস্তাবে রাজি হয়নি। এরপর বিভিন্ন ভয়-ভীতি দিতে থাকে। এক পর্যায়ে জাহাঙ্গীর পরিকল্পনা করে রাতে জোর করে উঠিয়ে নিয়ে যাবে। এমনকি একদিন রাতে দলবলসহ এসে পড়ে। সৌভাগ্য চন্দনার। চন্দনা ঐদিন বাড়িতে ছিল না। পরের দিন পাড়া সকলে মিলে সিদ্ধান্ত নিল চন্দনাকে রাখলে বিপদ হতে পারে। সে ভয়ে তাকে এখানে রাখ যাবেনা। সহাদেব নিজ কন্যাকে তার মামার বাড়িতে পাঠিয়ে দিল। সেই থেকে আজও পর্যন্ত জন্মভূমি হরিণখোলার মাটিতে চন্দনা পা রাখেনি। দেখা হয়নি ঐপাড়ার বন্ধু বান্ধবদের সাথে চন্দনা এখন মামার বাড়িতেই আছে। এখানে আসার জন্য তার মন ব্যস্ত হয়েছে। কিন্তু প্রতিবেশীরা ভয় পাচ্ছে বিধায় তাকে এখানে আনা হচ্ছে না। দেখা হচ্ছে না তার পৈত্রিক ভিটামাটির সাথে।

তথ্যসূত্র:

১. চোট্রি মুণ্ডা এবং তার তীর-মহাশ্বেতা দেবী, ২. দলিত সাহিত্যের দিগবলয়-মনোহর বিশ্বাস, ৩. উন্নয়ন পদক্ষেপ ২০ সংখ্যা স্টেপস্ টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, ঢাকা। ৪. সুন্দরবনের লোক সমাজ ওদেবদেবী - রফিকুল ইসলাম ৫. মাঠ পর্যায় জরিপ পরিত্রাণ ৬. কমুউনিটি ডেভলপমেন্ট ..পোর্ট-পরিত্রাণ ৭. ভারতের আদিবাসী ও দলিত সমাজ-পশুপতি প্রসাদ মাহা ৮. আদিবাসী।